অবিবাহিত নারী পিতার ওপর, স্ত্রী স্বামীর ওপর এবং বিধবা অবস্থায় পুত্রের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মনুর মতে, নারী মাত্রেই মোহিনী।

এই সময়ে সনাতন বর্ণভিত্তিক সমাজ বিদেশি লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। ভারতীয় সাহিত্যে এই বিদেশিদের বলা হয়েছে যবন; আগে থেকেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে তারা বসতি স্থাপন করেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের যে বিশাল সংখ্যক খরোষ্ঠী লেখ এই অঞ্চলে পাওয়া গেছে তাতে কিন্তু যবন কথাটির উল্লেখ নেই; যে নামগুলি পাওয়া যাচ্ছে তা সবই গ্রিক। মুদ্রা, টেরাকোটা, ভাস্কর্য ইত্যাদি কুষাণ নিদর্শন ইঙ্গিত করে কুষাণগণ বহু সংখ্যায় ভারতে এসেছিল। পশ্চিম ভারতে কার্লের দান সংক্রান্ত লেখগুলিতে যে বিরাট সংখ্যক যবনদের দেখা যায় তাতে এর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে যবনদের উপস্থিতি প্রশ্নাতীত, দক্ষিণ ভারতেও বৈদেশিক বাণিজ্যের কারণে সমৃদ্ধ বেশিরভাগ নগরকেন্দ্রে এই সময় প্রচুর সংখ্যক যবন বাস করত। সঙ্গম সাহিত্যে বারবার এদের উল্লেখ দেখা যায়। বলা হয়েছে কাবেরীপত্তনম নগরে (কাবেরী নদীর মোহনায় অবস্থিত) এদের বাড়িঘর দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ভারতে বিদেশিদের উপস্থিতি এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি জাতি ব্যবস্থার পক্ষে ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের পক্ষেও এদের 'সমাজবহির্ভূত' আখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। বরং তাঁদের এদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় যেতে হয়। একথা জানা গেছে 'মহাভারত' থেকে। এই মহাকাব্যের এক স্থানে তাদের যযাতির সন্তান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে তারা এবং পহ্লবগণ বশিষ্ঠের গাভী থেকে জাত। একটি স্থানে যবনদের হেয় করা হয়েছে শূদ্র আখ্যা দিয়ে। অন্য এক জায়গায় ইন্দ্র বলছেন, যদি তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসরণ করে তাহলে তাদের ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান দেওয়া যেতে পারে। উল্লিখিত মন্তব্যগুলি যদিও পরস্পরবিরোধী, তথাপি সেগুলি ইঙ্গিত করে ভারতীয় সমাজে বিদেশিদের আত্মস্থ করার চেষ্টা চলেছিল। চাতুর্যের সঙ্গে মনু তাদের 'পতিত ক্ষত্রিয়' (*ব্রাত্য ক্ষত্রিয়*) নামে ভূষিত করে।

ভারতীয় সমাজে বিদেশিদের প্রবেশ সহজ হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে; কারণ এই ধর্মে জাতিভেদ প্রথার সমস্যা ছিল না। এই কারণেই বেশ কয়েকজন বিদেশি শাসক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ইন্দো-গ্রিক রাজা আগাথোক্লেস তাঁর মুদ্রায় বৌদ্ধ প্রতীক ব্যবহার করেন। মেনান্দারও তাই। গ্রিক বংশ উদ্ভূত সাধারণ কয়েক ব্যক্তি ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ সংঘে দান করেছিলেন। ইরিল নামে এক ব্যক্তি জুনোর-এ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্য দুটি জলাধার নির্মাণ করেন। একই স্থানে চিত্ত নির্মাণ করেন সংঘের জন্য সভাকক্ষ। ইন্দ্রাগ্নিদত্ত নাসিকে গুহা খনন করেন। অন্তত সাতজন গ্রিক কার্লেতে স্তম্ভ নির্মাণ করেন। কুষাণগণ, বিশেষত কণিষ্ক, বৌদ্ধ

Scanned by CamScanner

প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদারহস্তে দান করেন। তাঁদের সময়ে বিদেশে বেশ কয়েকজন ধর্মপ্রচারককে পাঠানো হয় এবং বৌদ্ধধর্ম বিদেশিদের সংস্পর্শে আসে। প্রসারকালে বৌদ্ধধর্ম বহু নতুন ধ্যানধারণা গ্রহণ ও আত্মস্থ করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অ-ভারতীয় কর্তৃক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য গ্রিকো ব্যাকট্রীয় রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস-এর দূত হেলিওডোরাস-এর বিদিশাতে স্তম্ভ লেখ (আ. খ্রিস্টপূর্ব ১২০-১০০)।

বৌদ্ধধর্মের দেশীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মূলত বণিকশ্রেণী। সব রকম উপাদান থেকেই জানা যায় এরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। বণিকদের দাক্ষিণ্যেই এই যুগে গড়ে ওঠে অসংখ্য স্তূপ আর মঠ। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে বাণিজ্যেরই মাধ্যমে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সুপরিচিত গিরিপথ ধরে যে বাণিজ্যপথটি ছিল, দেশের ভিতরে তারই ধারে-ধারে গড়ে উঠেছিল বেশিরভাগ বৌদ্ধ গুহাস্থিত মঠ। যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপিত এই মঠগুলি ছিল বণিকদলের বিশ্রাম স্থল, বাড়িঘর এবং ব্যাংকিং ভবন।

ভক্তদের প্রচুর দানে বৌদ্ধ মঠগুলি সম্পদের ভাণ্ডার হয়ে ওঠে। কার্লে-তে বিহারের প্রধান অংশে এবং দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি বিহারের প্রধান সৌধের ভিতরে এমন কয়েকটি কুঠুরি দেখা যায় যেখানে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। এই কুঠুরিগুলি সম্ভবত মূল্যবান জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার জন্য ব্যবহৃত হত। বাইরের দিকের বেশিরভাগ কুঠুরিগুলিতে ছিল কাঠের শক্ত দরজা যা ভিতর থেকে যেমন বন্ধ করে রাখা যায়, তেমনি তালা দিয়ে রাখা যায় বাইরে থেকে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় মঠগুলিতে প্রচুর ধনদৌলত থাকত। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ বৌদ্ধমঠগুলিতে যে দান করতেন তার লিখিত বিবরণও পাওয়া গেছে। এর দৃষ্টান্ত সাঁচীতে বৌদ্ধ মঠগুলিতে ছশোটি নথিবদ্ধ দানের মধ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের দানের সংখ্যা দুশো। দান করার মতো যথেষ্ট অর্থ নিশ্চয়ই তাঁদের ছিল। এ থেকে বোঝা যায় আগেকার বৌদ্ধ বিধি তারা লঙ্ঘন করেছিলেন। এই বিধি অনুযায়ী বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ লাভের পূর্বে সব সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে জাগতিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করতে হত। সংসারত্যাগীরাই সংসারের পরগাছা হয়ে দাঁড়াল। ফলে অনিবার্য হয়ে পড়ল বৌদ্ধধর্মের নতুন ব্যাখ্যার।

বুদ্ধের মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বেশ কয়েকটি সম্মেলনের মাধ্যমে বৌদ্ধ সংঘের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়। এতে খুব যে সাফল্য এসেছিল তা নয়। কণিষ্কের সময়ে প্রায় আঠারোটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁর সময়ে কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেই বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ধর্মগত প্রভেদ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে। এই ধর্মের গোঁড়া অনুগামীগণ

Scanned by CamScanner

দাবি করে যে তারাই আদি বৌদ্ধবাণীর ধারক। এই অনুগামীদের বলা হল হীনযান সম্প্রদায়। কালক্রমে শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হীনযান বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ভারত, মধ্য এশিয়া, তিব্বত, চিন আর জাপানে মহাযান মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাযান মতের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম প্রধান ছিলেন নাগার্জুন। উত্তর দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান নাগার্জুন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

মহাযান ধর্মমতের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য বোধিসত্ত্ব ভাবনা। বৌদ্ধধর্মের আদি ধ্যানধারণারই ফলশ্রুতি। পুরোনো ধর্মমত অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব-র বাস প্রজ্ঞা ও প্রেমে। তিনি দয়া ও করুণামূলক কাজ অনেক করেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেই বুদ্ধ হন। সাধারণ বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করা হয় তাঁকে অনুকরণ করে *নির্বাণ* লাভ করতে। মহাযান ধারণা অনুযায়ী তিনিই বোধিসত্ত্ব যিনি নিঃস্বার্থভাবে সকলের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন এবং যাতে সমস্ত প্রাণী নির্বাণ লাভ করতে পারে তার জন্য অপেক্ষা করেন। ব্যক্তিগত 'মুক্তি লাভ' ছিল আদি বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য; নতুন ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল সকলের মুক্তি। বোধিসত্ত্বকে মনে করা হত বুদ্ধের পূর্বজন্মের অবতার। এ থেকে বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে নানা জন্মগ্রহণের মাধ্যমে পুণ্য সঞ্চয় সম্ভব। মহাযান মত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করে এই পুণ্য ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে হস্তান্তরিত করা সম্ভব। বৌদ্ধদের বেশ কিছু সংখ্যক দান সম্পর্কিত লেখ অনুসারে যে ব্যক্তির নামে পুণ্যফল হস্তান্তরিত করা হবে তার নামে একটি পুণ্যকাজ অনুষ্ঠিত করতে হবে।

মহাযান ধর্মে বোধিসত্ত্ব কেবল করুণার প্রতিমূর্তি নন, তিনি দুঃখেরও প্রতিমূর্তি যিনি নিজে দুঃখ ভোগের মাধ্যমে মানুষের পরিত্রাণ বিধান করেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম স্পষ্টতই সমকালীন পশ্চিম এশিয়ায় প্রচলিত একটি ধারণার কাছে ঋণী ছিল। পরিত্রাতার দুঃখভোগের ধারণা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল মৈত্রেয় বুদ্ধের ধারণা যিনি ভবিষ্যতে মানবজাতির ত্রাণ করবেন। কালক্রমে মহাযান মত মহান, শুভঙ্কর বোধিসত্ত্বমণ্ডলীর সৃষ্টি করে; তাঁরা অচিরেই ভক্তদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের পাত্র হয়ে ওঠেন। স্বয়ং বুদ্ধ এক মহান আধ্যাত্মিক সত্তার পার্থিব প্রকাশ রূপে বিবেচিত হতে থাকেন। একজন ধর্মাচার্য থেকে পরিত্রাতা দেবতা রূপে তাঁকে উন্নীত করা হয়। বুদ্ধের প্রতি সহজ বিশ্বাসের জায়গায় অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও জাদুক্রিয়া সহযোগে বুদ্ধমূর্তির পূজা শুরু হয়। ধর্ম প্রবর্তক বুদ্ধ নিশ্চয়ই এই প্রক্রিয়াকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখতেন। আগেকার মতো বৌদ্ধ প্রতীকগুলিকে এই যুগেও পূজা করা হত, তবে খ্রিস্টাব্দের সূচনা পর্বে তাঁর মূর্তি পূজার ক্রমশ ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের বলে অনুমিত বুদ্ধের প্রাচীনতম মূর্তিগুলির একটি পাওয়া গেছে মথুরা থেকে। বুদ্ধ ব্যক্তি দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন ভক্তগণ আপদে-বিপদে যাঁর কাছে প্রার্থনা

Scanned by CamScanner

জানাতে পারে। এই কারণে মহাযান মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ভক্তিবাদ। এইভাবে চতুর্থ বৌদ্ধসম্মেলনের পর যে বৌদ্ধধর্ম দেখা গেল তা এর প্রবর্তকের ধ্যানধারণা থেকে অনেকটাই ছিল স্বতন্ত্র।

বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মেও পরিবর্তন এসেছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের শেষদিকে এই ধর্ম ভাগ হয়ে যায়। রক্ষণশীল জৈনগণ পরিচিত হন *দিগম্বর* (আকাশকে যাঁরা পরিধান করে আছেন) রূপে। আর উদারপন্থী জৈনগণ পরিচিত হন *শ্বেতাম্বর* (শ্বেত পরিচ্ছদধারী) রূপে। মগধ থেকে জৈনগণ পশ্চিমে মথুরার দিকে, পরে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হয়ে শেষে সৌরাষ্ট্রে বসতি স্থাপন করেন। কলিঙ্গের দিকেও তাঁদের অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল; সেখানে কিছুকাল তাঁরা খারবেলের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করেন। বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মেও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। হাতিগুম্ফা লেখ থেকে জানা যায় অনেক আগে নন্দরাজগণের আমলেই কলিঙ্গ থেকে পাটলিপুত্রে একটি জিনমূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে খারবেল আবার এই মূর্তিটি কলিঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান। মথুরাতে বেশ কিছু সংখ্যক সুচারুভাবে উৎকীর্ণ জৈনমূর্তি ও জিনমূর্তি সংবলিত আয়াগপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে জৈনধর্ম রক্ষণশীল হয়ে পড়েছিল।

বৌদ্ধধর্ম ও অন্যান্য প্রতিবাদী ধর্মের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পশু হত্যার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বৈদিক রীতিনীতি ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বেদবিরোধী আন্দোলনকারীদের আক্রমণের ফলে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। এই অবস্থায় যে লৌকিক ধর্মগুলির অনুগামীর সংখ্যা ছিল বিপুল সেই ধর্মগুলিকে আত্মস্থ করে নেয় ব্রাহ্মণ শ্রেণী। এই প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বেশিরভাগ বৈদিক দেবতা সরে যান, তাঁদের স্থান অধিকার করেন ত্রয়ী—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং অশুভশক্তি আক্রান্ত জগতের ধ্বংসকর্তা শিব। কালক্রমে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য দেবতারূপে শিব ও বিষ্ণুর উত্থান ঘটে। এই দুই দেবতার ভক্তগণ পরে দুই সম্প্রদায়ে পরিণত হন।

বিষ্ণুকে মনে করা হয় সর্বপ্রধান দেবতা। ব্রহ্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার পর সমুদ্রে সহস্রফণা শেষনাগের ওপর শায়িত বিষ্ণু জেগে উঠে সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্বর্গ বৈকুণ্ঠ থেকে জগৎ শাসন করতে শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি জগতের সব কিছুর ওপর দৃষ্টি রেখেছেন। যখনই জগতে অশুভ শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তিনি বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হন মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য। সম্ভবত এই ধারণা এসেছিল বৌদ্ধধর্মের বোধিসত্ত্ব তত্ত্ব থেকে। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভিন্ন হওয়ার পরেও অবতারবাদের সূচনা হতে পারে। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ বর্ণিত হয়েছেন ইন্দ্রের শত্রু দৈত্য

Scanned by CamScanner